Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 461 - 470
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের হয়ে ওঠা : বিদ্যাসাগরের গদ্যশৈলী এবং আখ্যান ভাবনা

ড. গার্গী সরকার
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, নাকাশীপাড়া
Email ID : gargeekol@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Prose, Structure, Renaissance, Colonialism.

Abstract
19th century Kolkata plays an important role in socio-cultural history of Bengal. It is the period of shift in the paradigm towards the Kolkata based urban colonialism. It is in this time that the first printing press was established in Srirampore, Hooghly. Immediately after this the Fort William College was also established. The college taught vernacular language to the workers of the East India Company. The pandits of Fort William College made a significant contribution in development of Bengali prose in early days.

Vidyasagar as a writer of Bengali Prose can't be placed after the pandits of Fort William College and the critical prose of Raja Rammohan Roy. The present paper mainly Focus on Vidyasagar's two translation – 'Shakuntala' and 'Sitar Banabas'. It has to be Keep in mind that Vidyasagar is not the firstprose writer in Bengali but it is he who unfettered the Bengali Prose from the influences Sanskrit and English and at the same time made it structurally independent.

The next part of the article deals with the structural aspect of Vidyasagar's prose. We all know that love for story telling is one of the oldest characteristics of Indian literature. Every primary epic or a medieval poetry has a particular storyline. 'Shakuntala' and 'Sitar Banabas' are based on Indian mythology but Vidyasagar changed the storyline of both these texts on order to make it relevant in the period of early Bengal Renaissance to what the paper aims to highlight. The inner conflict of both the stories can be a prelude to the Bengali novel is what the main paper also Focus upon.

Discussion

বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক বিশেষ একটি সময়। মধ্যযুগ দেবনির্ভর এবং ধর্মসাহিত্য কেন্দ্রিক। সৃষ্টির কেন্দ্রে আছেন ঈশ্বর, তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় আপামর বাঙালির জীবন। কিন্তু ঢিমে তালে চলতে থাকা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 461 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সে জীবনে বিচলন নিয়ে এল ঔপনিবেশিকতার অভিঘাত। ১৭৫৭-র পলাশীর যুদ্ধে নবাব পক্ষের পরাজয়, ১৭৬৪-র বক্সারের যুদ্ধ ও ১৭৬৫-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের মতো ঘটনাগুলি ইংরেজদের বণিক বৃত্তিকে ছাপিয়ে শাসক হয়ে ওঠার মাইলস্টোন হিসেবেই ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছে। এরই সঙ্গে যুক্ত লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। যার মধ্য দিয়ে গ্রাম সমাজের সামন্ততান্ত্রিক আদলটি ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করলো। কাজ হারিয়ে মানুষ ভিড় করতে লাগলো নবউদীয়মান কলকাতায়। বিদেশ থেকে আসা ঔপনিবেশিক শক্তি তার মায়া বিস্তার করছে কলকাতা ও তার আশেপাশে। এই রকমই এক আলো আঁধারি সময়ে হুগলীর শ্রীরামপুরে স্থাপিত হল বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা।

ইংরেজরা বুঝে নিয়েছিল যে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে শাসন ব্যাবস্থা কায়েম করতে গেলে শাসিতের ভাশাকে আয়ত্ত করতেই হবে। কারা শিখবেন বাংলা ভাষা? শিখবেন ইংল্যান্ড থেকে আগত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা। তাদেরি শিক্ষার জন্য তৈরি হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বলাবাহুল্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা তৈরির যৌথ ফলশ্রুতি হল বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের সূচনা।

(১)

মধ্যযুগে ধর্ম সাহিত্য ব্যাতিরেকে অন্য কোন সাহিত্যের যেমন অস্তিত্বই ছিলনা, তেমনি সাহিত্য সং রূপ বলতে কেবলই ছিল পদ্য। সেই চর্যাপদ থেকে শুরু করে রামরাম বসু রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনার পূর্ব পর্যন্ত। তাই বলে কি মধ্যযুগে গল্পের টান বলে কিছুই ছিল না? ছিল তো। গল্প শোনার আগ্রহ ব্যক্তির আজন্মের। ফর্ম হিসেবে গদ্যের আবির্ভাব না হলেও গল্পের তরে জোনাকির ঝিলমিল চিরকালীন। আমাদের যে কোনো আদি মহাকাব্যগুলি সে রামায়ণ মহাভারত হোক কিম্বা ইলিয়ড ওডিসি আসলে কোনো না কোনো আখ্যানই বর্ণনা করে। কিম্বা ঐ যে চণ্ডীমঙ্গল পড়বার সময় উত্তর লিখতে হয় মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে উপন্যাসগুণ বা এ যুগে জন্মালে তিনি সার্থক ঔপন্যাসিক হতেন কিনা – এসব প্রশ্নের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে আখ্যানের যাদু। বস্তুত যে কোনো মঙ্গলকাব্যের কাহিনি কাঠামো— মনসামঙ্গলের চাঁদ–মনসা দ্বন্দ্ব, চণ্ডী মঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরার সংসার, এমনকি দেব খণ্ডের গৌরী মেনকা মহাদেবের ছবি আসলে আমাদের গল্পই বলতে চায় কাব্যের আধারে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের কথা। মধ্যযুগে কাব্য ছাড়া অন্য কোনো সংরূপের অস্তিত্ব ছিল না বলেই অমন দর্শন সর্বস্ব রচনাও লিখতে হয় ছন্দে। কেন ছন্দে? কারণ কাব্য ছন্দের দোলা শ্রুতিতে গদ্যের চেয়ে দ্রুত প্রবিষ্ট হয়। যেহেতু মধ্যযুগের যে কোনো গ্রন্থই হাতে লেখা পুঁথি তাই তা সংখ্যায় অনেক কম। ফলে স্মৃতিতে ধারণ করার জন্য কাব্যের শ্রুতিময়তা ছাড়া পথ নেই। কিন্তু ছাপাখানা সেই বাধা দিল সরিয়ে। মুদ্রণ যন্ত্রে একই বই একসঙ্গে বহু সংখ্যায় ছাপা হতে লাগলো। বিক্রিও শুরু হল। ফলে মনে রাখার দায় আর রইল না। এভাবেই আবির্ভাব ঘটলো বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের। চিঠি, দলিল দস্তাবেজের ভাষা সুচারু সংহত রূপ ধারণ করবে বাংলা গদ্যের পরিসরে। বলাবাহুল্য এই গদ্য পরিসরটির নির্মাণে বিদ্যাসাগরের অবস্থান এবং অবদান বিশ্লেষণ আমাদের মূল বিবেচ্য।

তার আগে আমরা বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যিক গদ্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করবো। একই সঙ্গে খুঁজে দেখতে চাইব বিদ্যাসাগরের গদ্যের শিকড় কোনো পূর্বজর মধ্যে থেকে গিয়েছিল কিনা। আবার বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের অভিনিবেশ থাকবে উত্তরাধিকার অনুসন্ধানেরও।

খ্রিষ্টধর্ম প্রচার এবং কোম্পানির শাসন প্রক্রিয়ায় সুবিধা করে দেবার উদ্দ্যেশ্যে বিলেত থেকে নবাগত কোম্পানির কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। কলেজের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন উইলিয়ম কেরি। ১৮০১ সালের মে মাসে খোলা হল বাংলা বিভাগ। বাংলা গদ্যের ইতিহাসটি বঝবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি একবার আমাদের চোখ বুলিয়ে নিতে হবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত গদ্যের তালিকাটির দিকে –

১। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	রামরাম বসু	১৮০১
২। কথোপকথন	উইলিয়ম কেরি	১৮০১
৩। হিতোপদেশ	গোলোকনাথ শর্মা	১৮০২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 461 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪। লিপিমালা	রামরাম বসু	১৮০২
৫। বত্রিশ সিংহাসন	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮০২
৬। ঈশপের গল্প	তারিণীচরণ মিত্র	১৮০৩
৭। তোতা ইতিহাস	চণ্ডীচরণ মুন্সি	১৮০৫
৮। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় চরিত্র	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১৮০৫
৯। হিতোপদেশ	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮০৮
১০। রাজাবলি	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮০৮
১১। ইতিহাস মালা	উইলিয়ম কেরি	১৮১২
১২। পুরুষ পরীক্ষা	হরপ্রসাদ রায়	১৮১৫

বিদ্যাসাগর পরবর্তী বাংলা গদ্য রীতির আলোচনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর ভিতর থেকে আমরা বেছে নেব তিনজনকে— উইলিয়ম কেরি, রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

উইলিয়ম কেরির রচনা অর্থাৎ 'কথোপকথন' এবং 'ইতিহাসমালা' দুটিতেই কথ্য ভাষাকে সাধু ভাষার কাঠামোর মধ্যে বাঁধবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'কথোপকথন' একেবারেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার আদি বা মূলগত লক্ষ্য কে মাথায় রেখে রচিত। নব্য সিভিলিয়নদের কাজ চালানোর উপযোগী সব স্তরের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনকারী ভাষা শেখানোর কৌশল এটি। মুন্সি, চাকর, কৃষক, মজুর, যাজক, যজমানের সঙ্গে কথপকথনের ছবি, মেয়েদের কথনরীতি তুলে ধরেছেন কেরি। রচনাটি শুরুই হয়েছে 'চাকর ভাড়াকরণ' প্রসঙ্গ দিয়ে –

> "সাহেব সেলাম।
> শেলাম।
> তুমি কেটা। তোমার বাটি কোথায়।
> সাহেব আমার নাম রমজান। অ্যামার বাটি কলিকাতায়।
> কহ কি নিমিত্ত আসিয়াছ।
> সাহেব আমি বেকার আছি চাকরির চেষ্টায় আসিয়াছি।
> তুমি কি কার্যের চাকরি করহ।
> সাহেব আমি সাহেবলোকের খানসামাগিরির কায করিয়া থাকি।"[১]

লক্ষ্য করবার বিষয় প্রশ্ন সূচক বাক্যে কোন প্রশ্ন চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে না। দাঁড়িই একমাত্র বিরতি চিহ্ন। আবার ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কীভাবে লৌকিক বাচন ভঙ্গি 'তুমি কেটা' এবং 'কহ কি নিমিত্ত আসিয়াছ'-র মতো ধ্রুপদী বয়ান মিশে যাচ্ছে। আবার শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বাটি সংস্কৃত তৎসম শব্দ এবং খানসামা খেদমত প্রমুখ আরবি-ফারসি শব্দ পাশাপাশি অবস্থান করছে। অন্যদিকে 'ইতিহাসমালা' বিভিন্ন প্রচলিত কাহিনির সংক্ষিপ্ত গল্পরূপ- 'A Collection of Stories in The Bengalee Language Collected From Various Sources'. বিশেষভাবে বলবার যে আমরা Story অর্থাৎ গল্পের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি বাংলা গদ্য সংরূপের প্রকাশিত বয়ানে। 'ইতিহাসমালা' র ভাষা বেশ সাবলিল। পড়তে গিয়ে কোথাও আড়ষ্টতা লাগে না –

> "কাশ্মীর দেশে বিষ্ণুপদ নামে এক ব্রাহ্মণ – তাহার চারি পুত্র। ঐ চারিজন সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত আর চারি ভাইর বড়ই প্রীতি।

এক দিবস ঐ চারিজন নির্জন স্থানে থাকিয়া বিচার করিলেন যে,

> "আমরা অনেক শাস্ত্র পড়িয়া বিদ্যা করিলাম, কিন্তু মৃত জীব যাহাতে প্রাণ পায় এমত বিদ্যা শিক্ষা করিব'।"[২]

বেশ বোঝা যাচ্ছে ১৮০১ থেকে শুরু করে ১৮১২-র পথে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের একটি কাঠামো কিন্তু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 461 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এবার আসা যাক রামরাম বসুর কথায়। রামরাম বসুর রচনায় ফার্সি এবং সংস্কৃত শব্দ যুগপৎ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রামরাম বসুর রচনা ভারতচন্দ্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'লিপিমালা' কথ্য ভাষার কাছাকাছি হলেও 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এর ভাষা যেখানে যেখানে সংস্কৃত প্রধান সেখানে সেখানে বেশ আড়ষ্ট –

> "বাহিরে শুভ লগ্নানুসারে মহারাজার অভিষেক করিয়া চকের মধ্যস্থলে স্ফটিক রচিত শোভাকর মঞ্চে দিব্য সিংহাসন শোভা করিতেছে তাহার মধ্যে আসন করাইলেন মঞ্চের উপরে রাজা প্রতাপাদিত্যকে রত্ন আভরণে ভূষিত করিয়া স্বর্ণ টোপর মস্তকে দিয়া সিংহাসনে বসাইলে এক কালে জন্ত্রিরা সমস্ত জন্ত্রে ধ্বনি করিলে বাদ্যের শব্দ অতিশয় হইয়া সমস্তকে কম্পিত কম্পমান করিলেক।"[৩]

- দীর্ঘ একটি মাত্র বাক্য, কোথাও কোন ছেদ বা যতি চিহ্ন নেই।

অন্যদিকে কালের নিরিখে বিদ্যাসাগরের পূর্বসূরি রামমোহন রায়ের গদ্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ফারাক দুস্তর। এটা আমরা সকলেই জানি যে বাংলা গদ্যকে বিষয়ের ভার অর্জন করতে শিখিয়েছিলেন রামমোহন। বাংলা ভাষাতেও যে ন্যায়-বেদান্তের চর্চা করা সম্ভব তা রামমোহনেরই দেখানো। ১৮১৫-তে প্রকাশিত হয়েছিল রামমোহন রায়ের লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বেদান্ত সার'। রামমোহন প্রথম বাংলা গদ্যকে যুক্তি তর্কের বাহন হিসেবে ব্যবহার করলেন, জন্ম দিলেন বিতর্কমূলক নিবন্ধের। উদাহরণ হিসেবে আমরা তুলে ধরতে পারি 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রবন্ধের এই অংশটি –

> "এ অত্যন্ত অসঙ্গত, যেহেতু, আমারদিগের যে বক্তব্য, তাহার অন্যথা লিখিয়াছেন, কারণ সহমরণ সকাম ক্রিয়া হয়, আর কাম্য ক্রিয়াকে উপনিষদ এবং গীতাদি শাস্ত্রে সর্বদা নিন্দিত রূপে কহিয়াছেন, সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া সকাম সহমরণ হইতে বিধবাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস আমরা করিয়া থাকি, যে, তাহারা শরীরঘটিত নিন্দিত সুখের প্রার্থনা করিয়া পরম পদ মোক্ষের সাধনে নিবৃত্ত না হয়, এবং বন্ধন পূর্বক যে স্ত্রী বধ আপনারা করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিষেধ না করিলে প্রত্যবায় আছে, অতএব, বিশেষ রূপে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে উদবুদ্ধ হই।"[৪]

- বিদ্যাসাগরের বিতর্কমূলক গদ্যের সংবেদনশীলতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুত রামমোহন যে বিতর্ক মূলক প্রবন্ধের ধারা তৈরি করলেন তার উত্তরসূরি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর বিদ্যাসাগরের গদ্যের বীজ যার মধ্যে থেকে গিয়েছিল তিনি হলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার। সংস্কৃত জানার বৈভব সমৃদ্ধ করেছে তার গদ্যকে। বাংলাদেশের মানুষকে গদ্যের ফর্মে গল্পরসের সঙ্গে পরিচয় করালেন তিনি। সে ভাষার উদাহরণ দিতে গেলে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় 'রাজাবলী'র এই অংশটির কথা –

> "কান্যকুব্জ দেশের রাজা জয়চন্দ্র মহাবল পরাক্রম ছিলেন এবং বড় ধনী ছিলেন...। তাঁহার অনঙ্গমঞ্জরী আমে এক অপূর্বসুন্দরী কন্যা ছিলেন। তাঁহার বিবাহের নিমিত্তে যে বর উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার মনোনীত হইল না। পরে রাজা এক দিবস উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞেস করিলেন যে, আমি তোমার বিবাহের নিমিত্তে যে বর উপস্থিত করি, সে তোমার মনোনীত হয়না। ইহাতে তোমার মনস্থ কি, তাহা আমাকে কহ, আমি তদনুরূপ ব্যবস্থা করি।"[৫]

এই গদ্যের সাধু সাবলীলতার সঙ্গেই যখন লাবণ্য, সুষমা ও প্রসাদগুণ যুক্ত হয় তখনি তৈরি হয় বিদ্যাসাগরের গদ্য। যে গদ্য ১৮৪৭ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পথ নির্মাণ করেছে। যে গদ্য ছন্দের দোলায় আন্দোলিত হয় বিভূতিভূষণের অপু। যে গল্পের টানে বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণের শুরু সেই সাধু গদ্যের কাঠামোয় প্রাণসঞ্চার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 461 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করলেন বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যভাষার পদবিন্যাস রীতি অর্থাৎ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া-অব্যয়ের মধ্যে যথাযথ অন্বয় স্থাপনের কৃতিত্ব বিস্যাসাগরের। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষা –

> "তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য ভ্রমণ করিতে ২ তথাত উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গো অদূরে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে ২ শ্রী বিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহু হম্মারব করিতে লাগিবেন।"[৬]

আর সেখান থেকে বিদ্যাসাগরের গদ্য –

> "কিয়ত ক্ষণ পরেই, তাঁহাদের রথ গোমতীতীরে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে, সকল ভুবনপ্রকাশক ভগবান কমলিনীনায়ক অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিলেন। সায়ংসময়ে, গোমতীতীর পরম রমণীয় হইয়া ওঠে।"[৭]

- এই হয়ে ওঠার যাত্রাপথে বাংলা গদ্য পেল উপযুক্ত বিরাম চিহ্ন– কমা, সেমিকোলন, কোলন, ফুলস্টপ, বিস্ময় চিহ্ন, জিজ্ঞাসা চিহ্নের যথাযোগ্য ও সার্থক ব্যবহার। বাংলা গদ্যের অন্তরনিহিত ছন্দটিকে মর্মমূল থেকে চিনে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বাংলা ভাষার যথার্থ রূপের স্রষ্টা তিনি, তাই তো 'পথের পাঁচালী'-র অপুও ভুলতে পারেনা ছোটবেলার শ্রুতিলিখনের গদ্যকে। বড় হয়ে খুঁজে নেবে সে 'সীতার বনবাস' এর ভাষা –

> "লক্ষণ বলিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থল মধ্যবর্তী প্রস্রবনগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদ সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।"[৮]

বস্তুত শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সমাস বহুল প্রয়োগ সংস্কৃতগন্ধী হলেও বিদ্যাসাগরী গদ্যের মূল কৃতিত্ব বাংলা বাক্য গঠনের রীতিটিকে চিনে নেবার মধ্যে। যে রীতি সংস্কৃত বা ইংরেজির থেকে ধার করা নয় বরং বাংলার নিজস্ব, তাই তা আনন্য। যে গদ্যশৈলীর মাধুর্য দিয়ে বিদ্যাসাগর লেখেন –

> "রাম, পম্পাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, সীতাকে বলিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর; আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম প্রফুল্ল কমল সকল, মন্দ মারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া, সরোবরে নিরতিশয় শোভাসম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া রহিয়াছে, ...।"[৯]

এঁরই অনুরণন ধ্বনিত হবে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে—

> "চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।"[১০]

এভাবেই বাংলা গদ্য সাহিত্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে ছুঁয়ে, বিদ্যাসাগরের বিশ্বকর্মা রূপে মেতে, বঙ্কিমচন্দ্রের মায়ায় এক সুগঠিত অবয়ব লাভ করল।

(২)

আমাদের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনাটি বিদ্যাসাগরের আখ্যানরীতি বিষয়ে। আমরা সকলেই জানি যে বিদ্যাসাগরের মৌলিক সাহিত্যের পরিমাণ কম এবং যা আছে তা সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা। তবে অনুবাদ সাহিত্য বলতে যে তিনি আক্ষরিক অনুবাদ বোঝেননি, সে কথা বলাই বাহুল্য। বত্রিশ সিংহাসন, শকুন্তলা বা সীতার বনবাস কোনটাই মৌলিক নয় তবু, বাংলা গদ্য সাহিত্যের আলোচনায় তা প্রাসঙ্গিক। আমাদের আলোচ্য 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস'এর আখ্যান রীতি। যে কোনো আখ্যানই আসলে কী বলব আর কীভাবে বলব- ফর্ম এবং কন্টেন্ট কিম্বা আধার ও আধেয়র মধ্যেকার পার্বতী পরমেশ্বর সম্পর্ককে তুলে ধরে। 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' দুটি আখ্যানই মৌলিক নয়। সেক্ষেত্রে অতীত নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া স্রষ্টার মধ্যে কাজ করে। অনুবাদকের কালচেতনা বা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এসে মিশতে পারে। বস্তুত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 461 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অতীত থেকে বিশেষ উপাদান আহরণ করে তার পুনর্নির্মাণ একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' এর মধ্যে কীভাবে ফুটে উঠেছে আখায়ানের বয়ানে তাই আমরা খুঁজে দেখব। আবার বিদ্যাসাগরের গদ্য যদি হয় উপন্যাসোপম গদ্য তাহলে উপন্যাস হয়ে উঠতে পারা না পারার ক্ষেত্রটিকেও আমরা অন্বেষণ করব আখ্যানদ্বয়কে ছুঁয়ে।

যে অজস্র শ্রুতিগাথাকে একত্র করে মহাভারত নামক মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল 'আদি পর্ব' এর শকুন্তলা আখ্যানটি। সেই কাহিনিতে দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলার প্রতি গভীর ভাবে প্রেমাসক্ত হয়ে গান্ধর্ব বিবাহের প্রস্তাব দেয় শকুন্তলা বিবাহে সম্মতি দিলেও যুক্ত অরেছিলেন একটি শর্ত –এই বিবাহের ফলে জাত পুত্রকে দুষ্যন্তের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করতে হবে। এরপর শকুন্তলা যখন পুত্র ভরতকে নিয়ে রাজসভায় এসে উত্তরাধিকার দাবী করলেন তখন দুষ্যন্ত উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করেন। ভীষণ ক্ষুব্ধ শকুন্তলা দুষ্যন্তকে বংশ রক্ষার্থে স্ত্রী ও পুত্রসন্তানের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে তীব্র কটূক্তি করলেও শকুন্তলা পুত্রের স্বীকৃতির প্রশ্নে অটল থাকেন। অবশেষে তিনি যখন দুষ্যন্তের উপরই সন্তানের দায়িত্ব অর্পণ করে আশ্রমে ফিরে যেতে উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তেই অলৌকিক দৈববাণীর মাধ্যমে ঘোষিত হল যে এই পুত্র দুষ্যন্তেরই সন্তান। আর দুষ্যন্ত জানালেন এমন একটি অলৌকিক বা দৈব নির্দেশিত ঘটনার মাধ্যমেই তিনি তাদের সম্পর্কটির সার্বজনীন স্বীকৃতি তথা বৈধতার অপেক্ষায় ছিলেন।

মহাভারতের এই কাহিনিটিতেই দুটি অন্য প্রসঙ্গ যুক্ত করলেন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' এর রচয়িতা কালিদাস। কালিদাসের নাটকে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার সম্পর্কের স্বীকৃতির প্রতীক হয়ে এল দৈববাণী নয় 'অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়'। অন্যটি হল সেকালের লোককথায় প্রচলিত অভিশাপ প্রসঙ্গ। দুষ্যন্তের অতীত সম্পর্ক বিস্মৃতির কারণ হিসেবে এল দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত। অতীত থেকে চয়ন করা একটি উপাদানের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে তাকে উত্তরকালের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি দান করলেন কালিয়াস। মহাকাব্যের ভাষ্যতে পুত্রের প্রসঙ্গ, নারীর স্বাধিকারের দাবী মুখ্য। সেখানে ব্যক্তিসত্তা মাতৃসত্তা দুইই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কালিদাসের নায়িকা শৃঙ্গার রসে ভরা। করুণ রস থাকলেও তেজের দীপ্তি সেখানে অনুপস্থিত। আমরা বিদ্যাসাগরের অনুবাদ আখ্যানটির মধ্যেও খুঁজে নিতে চাই এমনি কোন স্বর। আবার সেই স্বরের মধ্যে কোথাও উপন্যাস হয়ে ওঠার চিহ্ন আছে কিনা তাও খুঁজে দেখব আমরা।

বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। শকুন্তলার শুরুতে রূপকথার গড়নটি ভারি চোখ টানে। ছোট ছোট বাক্যে বাংলা ভাষা যেন নিজের গতিতে শ্বাস নিতে থাকে –

> "অতি পূর্ব কালে, ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট ছিলেন। তিনি একদা বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলেন।"[১১]

এই সময়েই মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে তপোবন দুহিতা শকুন্তলাকে দেখে দুষ্যন্তের অভিব্যক্তি –

> "বুঝিলাম, আজি উদ্যানলতা সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল।"[১২]

এদিকে দুষ্যন্তকে দেখে শকুন্তলার মনের অনাস্বাদিতপূর্ব বিচলনকে বিদ্যাসাগর বর্ণনা দিলেন এই ভাবে—

> "শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপিরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়া, আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে?[১৩]

শকুন্তলার হৃদয় চাঞ্চল্য আখ্যানেও গতি আনে। অন্যদিকে অনসুয়া-প্রিয়ম্বদার কাছ থেকে দুষ্যন্ত জেনেছেন শকুন্তলার জন্ম পরিচয়ের কথা। ফলে সম্পর্কে বাধা থাকেনা কোনো। যে বিদ্যাসাগর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'- এর আদিরসাত্মক প্রসঙ্গ বর্জন করেন, তিনিই আবার কী অসাধারণ মাধুর্যে তুলে ধরেন নারীর ছলনার ভঙ্গিকে –

> "অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা, দুই চারি পা গমন করিয়া, ছলক্রমে কহিলেন, অনসূয়ে! কুশাগ্র দ্বারা আমার পদতল ক্ষত হইয়াছে, আমি শীঘ্র চলিতে পারি না; আর আমার বল্কল কুরুবক শাখায় লাগিয়া গিয়াছে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, ছাড়াইয়া লই।"[১৪]

এই সুযোগেই দেখে নেন দুষ্যন্তকে। ছবিটি অবশ্যম্ভাবীভাবে মনে করায় বৈষ্ণব পদাবলীর রাধিকাকে। এরপর সখীরা যখন শকুন্তলার শারীরিক ও মানসিক অস্থৈর্যের কারণ জানতে চেয়েছে তখন সে স্পষ্টতই জানিয়েছে দুষ্যন্তের প্রতি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 461 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার প্রণয় অনুরাগের কথা। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' অনুসরণে বিদ্যাসাগরও পদ্মপত্রে শকুন্তলার প্রণয় পত্রিকার কথা লিখেছেন। শকুন্তলার কথায় –

"তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি।"[১৫]

মনে রাখতে হবে, বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা' লিখছেন ১৮৫৫ সালে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ সবে অতিক্রান্ত। মাত্র ছ বছর আগে স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের নারী শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান 'বেথুন স্কুল' বিদ্যাসাগরেরই উদ্যোগে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হতেও এক বছর বাকী। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার কোনো সম্ভাবনাই তখন তৈরি হয়নি। সে সময় বাংলা ভাষার আখ্যানে নারীর প্রেমের দাবী উত্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যাক্তির হৃদয়বত্তার উন্মিলন কিন্তু উপন্যাসেরও লক্ষণ বটে। হৃদয়বত্তার কথা থাকলেও 'আভিজ্ঞান শকুন্তলম'এর আদি রস 'শকুন্তলা'য় অনুপস্থিত। সযত্নে এড়িয়ে যান সে প্রসঙ্গ। বস্তুত বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা জীবনের পাওয়া না পাওয়া, সুখদুঃখের যুগপৎ লীলার কথা বলে। আদর্শ জীবনবোধ নির্মাণের দায়টি বড় হয়ে ওঠে বিদ্যাসাগরের আখ্যানে। আখ্যান বয়নের ক্ষেত্রে কালচেতনার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আবার মহৎ আখানে কার্য কারণ সম্পর্কের দিকটি-ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই কণ্বমুনির দৈববাণীর মাধ্যমে শকুন্তলার বিবাহের খবর জানার প্রসঙ্গটি কাহিনিগত তথ্যের প্রয়োজনে বজায় থাকলেও কালিদাসের নাটকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা কালে আশ্রমতরুদের বহুমূল্যবান অলঙ্কার উপহার দেবার ঘটনাটিকে একেবারে বর্জন করেছেন বিজ্ঞাননিষ্ঠ বিদ্যাসাগর –

"প্রস্থান সময় উপস্থিত হইল। ...অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষা সমাধান করিয়া দিলেন।"[১৬]

আবার পতিগৃহে যাত্রার মুহূর্তটিকে অসম্ভব কাব্যময় ভাষা দিয়ে মুড়ে রেখেছেন বিদ্যাসাগর। জীবনে শিকড় ছেড়ে আসার যন্ত্রণা যে অনবদ্য কাব্যময় ভভাশা দিয়ে বোনেন বিদ্যাসাগর তা যেন তার বর্ণনার অনুপুঙ্খতায় এক নিবিড় মায়ার সৃষ্টি করে। এও কিন্তু উপন্যাসেরই বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের বর্ণনায় –

"তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হইতেছে, দেখ! জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল... ময়ূর ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বমুখ হইয়া রহিয়াছে। ...মধুকর মধুকরী মধু পানে বিরত হইয়াছে ...।"[১৭]

আবার কণ্বমুনি শকুন্তলার বিদায়কালে তাকে যে উপদেশ দিয়েছে তার মধ্যে লুকিয়ে আছে উনিশ শতকের সমাজে কন্যার পিতার স্বর। যে বিদ্যাসাগর মেয়েদের দুঃখে কাতর হন তিনিই তার আখ্যানে তুলে আনেন সমকালের সমাজ ছবি –

"স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিনীপদে প্রতিষ্ঠাতা হয়, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টক স্বরূপ।"[১৮]

'শকুন্তলা'-র কাহিনিতে অভিশাপ বৃত্তান্ত এসেছে। কিন্তু সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বলবার কথাটা এই যে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা কিন্তু কালিদাসের মতো অপাপবিদ্ধ, নির্দ্বন্দ্ব নয়, বরং সে মহাভারতের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলার সম্মিলিত রূপ এবং বিদ্যাসাগরের নিজস্ব নির্মাণ ও বটে। তাই দুষ্মন্তের সম্পর্ক বিস্মৃতির কথা জেনে তার উপলব্ধি –

"রাজমহিষী হইয়া অশেষ সুখ সম্ভোগে কাল হরণ করিব বলিয়া, যত আশা করিয়াছিলাম, সমুদায় এক কালে নির্মূল হইল।"[১৯]

অথবা, দুষ্যন্তের উদ্দেশ্যে শকুন্তলার স্পষ্ট উক্তি –

"তৎকালে তপোবনে তাদৃশী অমায়িকতা দেখাইয়া, ও ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে ...প্রত্যাখান করা তোমার উচিত নহে।"[২০]

যদিও কাহিনির গ্রন্থি মোচনের অংশে কালিদাস কাহিনির অনুগত থেকেছেন বিদ্যাসাগর তবু আখ্যানের বয়ানে মাঝেমাঝেই ঢুকে পড়েছে দ্বন্দ্বময়তা। আর তখনি হয়তো উপন্যাস হয়ে ওঠার একটা সম্ভাবনা তৈরি হতে থাকে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 461 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রামায়ণ কাহিনির শিকড় বাংলাদেশের জনজীবনের গভীরে প্রোথিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সূত্রে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল সীতার দুঃখময় ইতিবৃত্ত। আর বাল্মীকির রামায়ণের উত্তর কাণ্ড এবং ভবভূতির 'উত্তর চরিত' নাটককে মিলিয়ে বিদ্যাসাগর লিখলেন 'সীতার বনবাস', ১৮৬০–এ প্রকাশিত। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির জীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তারকারী পারিবারিক ছবি ধরা আছে সীতার বনবাসে। বাংলাদেশের যৌথ পরিবারের মাধুর্যের ছবি দিয়ে শুরু হয়েছে 'সীতার বনবাস' আখ্যান। আখ্যান বিন্যাসের দিকে যদি নজর দেওয়া যায় তাহলে পরিচ্ছেদ বিন্যাসগুলি হল – প্রথম পরিচ্ছেদে আলেখ্য দর্শন। দ্বিতীয় পরিছেদ চরমুখে সীতাপবাদ শ্রবণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ রামের প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত এবং লক্ষ্মণকে সেই ভার সমর্পণ। পঞ্চম পরিচ্ছেদে সীতা লব কুশের জন্ম দিলেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের ইচ্ছাপ্রকাশ এবং যজ্ঞের নিয়মরক্ষার প্রয়োজনে স্ত্রীর পরিবর্তে স্বর্ণসীতা নির্মাণ। সপ্তম পরিচ্ছেদে লব-কুশের বাল্মীকি রচিত রামায়ণ গান বর্ণন। অষ্টম পরিচ্ছেদে অযোধ্যাবাসীরা দীর্ঘদিন পরে সীতা ও তার দুই পুত্রের সঙ্গে পরিচিত হল। প্রজানুরঞ্জক রাজা রাম আগের মতো এবারও সীতা পরিগ্রহণের সর্বাঙ্গীণ অনুমতি পেলেন না। সীতাকে সতীত্ব প্রমাণের নির্দেশ দেওয়া হল। অপমানিতা সীতা মানব লীলা সংবরণ করলেন। কাহিনির মৌলিকতা এখানেই যে বিদ্যাসাগর কোথাও পাতাল প্রবেশ এর প্রসঙ্গ কাহিনিতে আনলেন না। সীতার মৃত্যুর জন্য সরাসরি সমাজ প্রবণতাকেই দায়ী করেছেন বিদ্যাসাগর। আর এর মধ্য দিয়েই কোথাও হয়তো বিদ্যাসাগর তাঁর আখ্যানে উনিশ শতকীয় সমাজে মেয়েদের অবস্থানটিকেই প্রতীয়মান হতে দিতে চান।

সীতার বনবাস যে করুণ রসাত্মক রচনা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাম চরিত্রের বিলাপ কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়েও পৌঁছে যায়। তবে 'সীতার বনবাস'এর আখ্যান রীতি আলোচনায় আমরা দেখাতে চাই রাম চরিত্রের দ্বন্দ্বপরায়নতার ক্ষেত্রটিকে। তিনি জানেন যে সীতা নিরপরাধ তবু প্রজানুরঞ্জক হয়ে ওঠার দায় থেকে বাধ্যত তাকে সীতা বর্জন করতে হয় কিন্তু সে ত্যাগ তাঁকে অনুক্ষণ নিবিড় বেদনায় দগ্ধ করতে থাকে, একথাও সত্যি। সংবেদনশীল বিদ্যাসাগরের হাতে রাম চরিত্রটি আখ্যনে রক্ত মাংসের সজীবতা পায় –

> ১। আমি প্রজানুরঞ্জনের অনুরোধে, প্রাণত্যাগে পরাঙ্মুখ নহি; ...সে বিবেচনায় সীতা পরিত্যাগ তাদৃশ দুরূহ ব্যাপার নহে।[২১]
>
> ২। সীতার শুদ্ধচারিতা বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমি, রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া নিতান্ত পরায়ত্ত হইয়াছি।[২২]

পাশাপাশি, সীতা চরিত্রটি বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সর্বযুগের সর্বকালের সেরা সতীত্বের আর্কেটাইপের মধ্যে অন্যতম। রামের যে কোন অন্যায় কাজ সম্পর্কে সীতা প্রশ্নহীন কিন্তু একটি জায়গায় এসে সীতার অবিচল ভক্তিতে বিচলন দেখি। এই একটি মাত্র জায়গায় আখ্যানে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় নারীর বয়ানে –

> "রাম পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ক্ষোভ, সেই সীতার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।"[২৩]

আর বলাবাহুল্য আখ্যান বা কাহিনির দ্বন্দ্ব ই উপন্যাস হয়ে ওঠার প্রথম ধাপ। যদিও স্বর্ণ সীতা নির্মাণের কথা শোনা মাত্রই সেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে।

(৩)

বিদ্যাসাগর এর পর আর এ জাতীয় আখ্যান কাহিনি রচনায় হাত দেননি। নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সমাজ সংস্কারের কাজে। আর তারপর ১৮৬১ তে রচিত হল 'মেঘনাদবধ কাব্য'; পরপরই 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। 'মেঘনাদবধ কাব্য' কীভাবে রামায়ণের কাহিনি কাঠামোকে ধারণ করেও স্রষ্টার নিজস্ব মনোভঙ্গির দ্বারা সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠতে পারে তা খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন বিদ্যাসাগর। বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে ভেঙে কীভাবে –

> "I despise Ram and his rabble but the idea of Ravana elevates and kindles my imagination...He was a grand fellow."[২৪]

- এই সত্যিতে পৌঁছানো যায় তা উপলব্ধি করেছিল উনিশ শতকের সাহিত্য সমাজ। ফলে পুরাণ কাহিনির ভাবানুবাদ আর নয়, এবার ডাক পড়বে মৌলিক রচনার। যেখানে বহুস্বর নয়, তৈরি হবে মহৎ কোন একক স্বর। একক স্বরের কথা বললেই মনে পড়ে অনুজ বঙ্কিমের ভাষা –

> "নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।"[২৫]

যে স্বর স্রষ্টার, সে আখ্যান তার বিবরণের ভিতরে স্থাপন করবে ঘটনার ঐক্য, নির্মাণ করবে এমন সব চরিত্র যা কেবল ও কেবলমাত্র লেখকের জীবনদর্শনকে ফুটিয়ে তুলবে। ব্যাক্তি-সমাজ-সভ্যতা-ইতিহাস ও সমকালীন জীবন সম্পর্কে বাস্তব আগ্রহ তৈরি করবে। তবেই জন্ম নেবে সার্থক উপন্যাস। কিন্তু তার আগে বাংলা গদ্য যার হাত ধরে রূপ নিতে শিখল, আখ্যানের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বকে চিনতে শিখল, তিনিই হলেন বিদ্যাসাগর।

Reference:

১. কেরি, উইলিয়ম, কথোপকথন, পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন (সম্পাদনা : অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২০২
২. তদেব, পৃ. ২৪৫
৩. বসু, রামরাম, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন (সম্পাদনা : অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৬২
৪. রায়, রামমোহন, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, রামমোহন রচনাবলী (প্রধান সম্পাদক ড অজিত কুমার ঘোষ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৯৮
৫. বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয়, রাজাবলি, শ্রীরামপুর প্রেস, হুগলী, ১৮৩৮, পৃ. ৪৩
৬. বিদ্যালঙ্কার, মৃত্যুঞ্জয়, বত্রিশ সিংহাসন, পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন (সম্পাদনা : অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৩০১
৭. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, সীতার বনবাস, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১১, পৃ. ৪১
৮. তদেব, পৃ. ১৮
৯. তদেব, পৃ. ২০
১০. চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১০৯৭
১১. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, শকুন্তলা, বিবেকানন্দ বুক স্টোর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৩
১২. তদেব, পৃ. ১৫
১৩. তদেব,পৃ. ১৮
১৪. তদেব, পৃ. ২১
১৫. তদেব, পৃ. ৩৩
১৬. তদেব, পৃ. ৪১
১৭. তদেব, পৃ. ৪১
১৮. তদেব, পৃ. ৪৩
১৯. তদেব, পৃ. ৪৮
২০. তদেব, পৃ. ৪৯
২১. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, সীতার বনবাস, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৪১১, পৃ. ৩৬

২২. তদেব, পৃ. ৩৬
২৩. তদেব, পৃ. ৭৩
২৪. সাহিত্য সাধনা অংশ, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সাধনা, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. তেত্রিশ
২৫. দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪৯৭

(এই প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ ব্যতিত রোমিলা থাপার রচিত ও নূপুর দাশগুপ্ত অনূদিত 'আখ্যানবলি এবং ইতিহাসের নির্মাণ' গ্রন্থটির কাছে ঋণী।)